মুঘল সম্রাট আকবরের ধর্মদর্শন ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

সাদিয়া আফরিন[১]

সারসংক্ষেপ

মুসলিম ভারতের ইতিহাসে মুঘল বংশের শাসনকাল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই মুঘল বংশের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সম্রাট ছিলেন আকবর। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ, প্রজাকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তবে তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতানীতির জন্য তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সম্রাট আকবর গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের প্রতি উদার ও সহনশীল আচরণ ব্যতিরেকে এখানে একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভাব নয়। মূলত এ লক্ষ্যেই তিনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস চালান। সকল ধর্মমতের সমন্বয়ে তিনি 'দীন-এ-ইলাহী' নামে একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। ফলে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র এক নতুন রূপে বিকশিত হয় এবং মুঘল সম্রাজ্যের স্থায়ীত্বকাল বেড়ে যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ননায় আকবরের এই ধর্মচিন্তাকে তাঁর শাসননীতির সফলতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আকবরের এই ধর্মদর্শন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

মূল শব্দঃ মুঘল সাম্রাজ্য, ধর্মদর্শন, ধর্ম নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, একেশ্বরবাদ, সুল-ই-কুল, দীন-এ-ইলাহী, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা।

ভূমিকা

মঙ্গল বংশোদ্ভূত মহাপরাক্রমী জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে যে মহান সম্রাজ্যের গোরাপত্তন করেন, তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পিতার দিক থেকে তৈমুর লং এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর হলেও সম্রাট বাবর নৃশংসতা, ব্যাপক হত্যা ও লুণ্ঠনের পক্ষপাতি কখনোই ছিলেন না। মুঘল সম্রাটগণ পূর্ববর্তী সুলতানি আমলের শাসকদের তুলনায় ভারতের আপামর জনসাধারণের নিকট অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এর পিছনের একটি বড় কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে

[১] প্রভাষক, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল sadia.crl@du.ac.bd

তাঁদের ধর্মসহিষ্ণু আচরণ। বাবর-প্রতিষ্ঠিত মুঘল সম্রাজ্য শুধু তার সামরিক শৌর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাতে নতুন মাত্রা দিয়েছিল অমুসলিম প্রজাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় নীতি থেকে শাসন নীতি পৃথক রাখার প্রচেষ্টা। সম্রাট বাবর তাঁর দুই পুত্র হুমায়ুন ও কামরানের সাথে মেদিনী রায়ের দুই কন্যার বিবাহ দিয়ে মুঘল-রাজপুত আত্মীয়তার সম্পর্কের বীজ বপন করেন। দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন ধর্মসহিষ্ণু আচরণের অধিকারী হলেও তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কাটে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে (সম্রাজ্য হারানো ও তা পুনুরুদ্ধার)। হুমায়ুনও তাঁর পিতার মতো অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী ছিলেন। হুমায়ুন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি অমরকোটের রাজপুত রাজা রাণাপ্রসাদের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্রের জন্ম হয়। হুমায়ুন-পুত্র সম্রাট জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর তাঁর ধর্মসহিষ্ণু আচরণের জন্যই ভারতবর্ষের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মুসলিম শাসকের মর্যাদা পান। সম্রাট আকবরের মতো ধর্মসহিষ্ণু ও প্রজাবান্ধব আচরণ পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররা যথাযথভাবে দেখাতে পারেননি। সর্বোপরি আকবর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংহতি অর্জনের জন্য এখানকার বিপুল সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহযোগিতার কথা যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কারণেই হয়তো আকবরকে 'মুঘলশ্রেষ্ঠ (Akbar the Great Mughal)' বলে আখ্যায়িত করেছেন অনেক ইতিহাসবিদ। শ্রীবাস্তব বলেন যে মুসলিম শাসনামলে আকবর ভারত-আত্মা আবিষ্কার করেছেন, অশোক-হর্ষের ভারতীয় সহনশীলতা তথা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি ভারতীয় আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন সম্রাট আকবরের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, "He was trully our national king"(Srivastava,1965:486-487)। আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় এই ধর্মসহিষ্ণুতা নীতির ধারাবাহিকতা বহুলাংশে বজায় থাকে। তবে একথাও ঠিক তাঁর সময়ে মুঘল-রাজপুত সম্পর্কের অবনতি না ঘটলেও মুঘল-শিখ বিরোধের বীজ বোপিত হয়। পরবর্তী মুঘল সম্রাট শাজাহানের সময় অবস্থার অবনতি ঘটে, ধর্ম সহিষ্ণুতার ইতিহাস নতুন মোড় নেয়। হিন্দু রাজপুত মাতার সন্তান হিসেবে সম্রাট শাহজাহানের ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া অনেকটা বাঞ্ছনীয় হলেও তাঁকে আমরা ধর্মীয়ভাবে কিছুটা অসহিষ্ণুই দেখতে পাই। সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণপূর্বক ভারতবর্ষে ইসলামি শাসন কায়েমের প্রয়াস পান। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট শাহজাহানের সময় থেকেই মুঘল-রাজপুত বিরোধের সুত্রপাত ঘটে এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ইতিহাসের সুত্রপাত হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়কালে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যা মুঘল সম্রাজ্যের পতন না ঘটাতে পারলেও এর স্বর্ণযুগের অবসান অবশ্যই ঘটায়। বর্তমান প্রবন্ধে সম্রাট আকবরের সহনশীল ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে তাঁর মহজরনামা, সুল-ই-কুল ও দীন-এ-ইলাহী নীতি পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরবর্তী সম্রাটদের উপর তাঁর এ ধর্মচিন্তার প্রভাব ও ধরণ সম্পর্কেও একটি সম্যক চিত্রতুলে ধরা হয়েছে।

উৎস পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

উপরিউক্ত বিষয়ে সমসাময়িককালে ফার্সী ভাষায় কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন *আকবরনামা*, *আইন-ই-আকবরী*, *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী*, *শাহজাহাননামা* প্রভৃতি। পরবর্তীকালে ওই সকল গ্রন্থ,

সরকারি বিভিন্ন ফরমান ও সম্রাটদের নির্দেশসমূহ অবলম্বন করে ইংরেজি ভাষায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু গবেষণাধর্মী বই প্রকাশিত হয়েছে। যেসকল গবেষক এ বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– Smith (1917, 1981), Tripathy (1963), Rizvi (1987), Srivastava (1965), Mahajan (1970), Majumdar (1978), Sarkar (1919), Sharma (১৯৮৯), Prasad (1974) প্রমুখ। এছাড়া বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি ফার্সী গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *আইন-ই-আকবরী* (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়), *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী* (আবদুল হামিদ লাহোরী), *শাহজাহাননামা* (আবদুল হামিদ লাহোইনায়েত খানরী) প্রভৃতি। উক্ত গবেষকদের আলোচনায় মুঘলদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুঘল দরবার ও সম্রাটদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক বিষয়ও স্থান পেয়েছে। তবে সম্রাট আকবর ধর্মীয় বিষয়ে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছিলেন, সেটিও অত্যন্ত গুরত্ব সহকারে উক্ত গবেষণাগুলোতে স্থান পেয়েছে। বলা হয় যে আকবরের রাজতৈনিক সফলতার মুলে কাজ করেছিল তার ধর্মীয় সহনশীলতানীতি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত নীতি ভারতবর্ষের জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। সর্বোপরি বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দৃশ্যমান, সেটি কোনো শুভ লক্ষণ নয়। আকবরের প্রদর্শিত সহনশীল ধর্মনীতিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণধর্মী। এ গবেষণাকর্মে মূলত সম্রাট আকবরের ধর্মচিন্তা ও তাঁর ফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎসের উপর নির্ভর করে এ প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। এ দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন গবেষকদের প্রমাণ্য গ্রন্থসমূহ। উক্ত গ্রন্থসমূহের সহায়তা নিয়ে সেসবের ক্রমধারায় মুঘল সম্রাট আকবরের ধর্মদর্শন বিষয়ে একটি নতুন কাঠামোতে প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সম্রাট আকবরের ধর্মদর্শন মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। তাঁর এ ধর্মচিন্তার কল্যাণে তিনি হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আনুগত্য অর্জন করতে সক্ষম হন, যা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাকে সুসংহত করে। এ বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। এজন্য এ বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি রচিত হয়েছে। গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- আকবরের ধর্মচিন্তার উৎস ও কারণ অনুসন্ধান করা;
- সহিষ্ণু ধর্মদর্শন নির্মাণে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করা;
- মহজরনামা, সুল-ই-কুল ও দীন-এ-ইলাহীর মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা;
- সমকালীন ভারতবর্ষে তাঁর ধর্মদর্শনের প্রভাব মুল্যায়ন করা;
- বর্তমান সময়ে এ ধরনের ধর্মচিন্তার গুরুত্ব অনুধাবন করা।

সম্রাট আকবরের ধর্মদর্শন

অনেক ইতিহাসবিদ সম্রাট আকবরের সময় মুঘল সম্রাজ্যের প্রসিদ্ধি এবং ব্যাপক প্রসারের জন্য তাঁকে মুঘল সম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকেন (Mahajan, 1970)। তবে আকবর তাঁর ধর্মনীতির জন্য সমাধিক প্রসিদ্ধ। আকবর অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাটকে কেবল সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব করলেই চলবে না, তাকে হতে হবে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি পূর্ববর্তী সুলতানি শাসকবর্গের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে শাসন ব্যবস্থা থেকে সাধারণ জনগণকে যতদিন বিচ্ছিন্ন রাখা হবে, ততদিন প্রশ্নাতীত আনুগত্যের উপর সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তীর্থকর ও জিজিয়াকর উচ্ছেদের মাধ্যমে আকবরের সমদর্শী নীতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রশাসনের উচ্চপদগুলো পূর্ববর্তী সুলতানি শাসকদের মতো শুধু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যোগ্যতার নিরিখে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন (সম্রাট বাবর ও সম্রাট হুমায়ুনের শাসনামলে অমুসলিম প্রজাবর্গ প্রশাসনের কিছু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তবে তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল না)। তাই এক্ষেত্রে বলা যায় যে মুঘল সম্রাট আকবর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার দিয়ে মধ্যযুগের উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেন।

ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন যে হিন্দুস্তানে যে সকল মুসলিম শাসক রাজদণ্ড পরিচালনা করেন, তাদের মধ্যে আকবর ছিলেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতানীতির সর্বাপেক্ষা উদার প্রবর্তক (Prasad,1974)। আকবরের এই উদার ধর্মীয় নীতির পশ্চাতে সমকালিন যুগের প্রভাব, বংশ পরম্পরা, রাজনৈতিক স্বার্থ ও তাঁর ব্যক্তিসত্তার উৎকর্ষতা কাজ করেছিল। আর পি ত্রিপাঠী এ প্রসঙ্গে বলেন যে "প্রাদেশিক স্তরে বিভিন্ন শাসকরা এই সমন্বয়বাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও আকবরের আগে আর কোন মধ্যযুগীয় শাসক কেন্দ্রীয়স্তরে ধর্ম সমন্বয়ের কথা ভাবেননি (Tripathy,1963:247)। ত্রিপাঠীর এ মন্তব্য একেবারেই অমুলক নয়। যদিও আকবরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ধর্মের প্রশ্নে উদারতা দেখা যায়, তথাপি ধর্ম সমন্বয়ের মতো অগ্রগামী চিন্তার প্রদর্শন তাঁরা করতে পারেননি। ফতেহপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নির্মাণের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার একটি কেন্দ্র তৈরি করা। বাদাউনির চিত্রায়নে ইবাদতখানা নির্মাণের মাধ্যমে আকবরের চিন্তাধারা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে 'সুল-ই-কুল'-এর মাধ্যমে পরধর্ম সহিষ্ণুতার এক নতুন যুগের উন্মোচন হয়, যা সময়ের সাথে রূপ নেয় ধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াসে। সম্রাট আকবর-প্রবর্তিত 'দীন-এ-ইলাহী' নবধর্ম হিসেবে জনমনে প্রভাব ফেলতে না পারলেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণকে প্রশ্নাতীত রাজানুগত্যে দীক্ষিত করেছিল। নিম্নে সম্রাট আকবরের উদার ধর্মদর্শনের উৎস ও তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

আকবরের ধর্মদর্শনের উৎস

অমরকোটের হিন্দু রাজপুত রাজা রাণাপ্রসাদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী আকবর স্বভাবতই তার পূর্ববর্তী তুর্কী শাসক তথা মঙ্গল পূর্বপুরুষদের তুলনায় ইসলাম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের প্রতি অনেক বেশি শ্রদ্ধাশীল হবেন। শিয়া মতাদর্শের অনুসারী তাঁর মাতা হামিদা বানু বেগম জনৈক পারসিক কবির

কন্যা ছিলেন। বলা যায় যে স্বভাবসুলভ ঔদার্য তিনি তার পারিপার্শ্বিকতা থেকেই পেয়েছিলেন। কথিত আছে– আকবরের শিক্ষক মীর আব্দুল লতিফ প্রখর যুক্তিবাদী ও সুফী মতাদর্শের অধিকারী ছিলেন, আকবরের মধ্যে সুফীচিন্তার বীজ তিনিই বপন করেন। চিশতিয়া সূফী সম্প্রদায়ের প্রতি আকবরের অনুরাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তিনি তাঁর প্রথম পুত্রের নামকরণ করেন শেখ সেলিম চিশতীর নামে (Rizvi, 1987)। এছাড়া আকবরের বন্ধুবৎসল আবুল ফজল, তাঁর পিতা মুবারক শাহ এবং ভ্রাতা কবি ফৌজির সুন্নীধর্মমতের প্রতি জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা তাঁর মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উদ্রেক ঘটায়। এছাড়াও কতিপয় হিন্দু রাজপুত পত্নীর সান্নিধ্য সম্রাট আকবরকে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাঁর ধর্মীয় নীতির উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে যৌবনে উদারপন্থী পণ্ডিত আব্দুল লতিফের সান্নিধ্য, শিয়া পণ্ডিতদের সংস্পর্শ, হিন্দু রাজপুত রাজকন্যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক, সহজাত সত্য–অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল–পরিতৃপ্তি ও সকল ধর্মের সাথে পরিচিতির জন্য ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থান্বেষী আব্দুন্নবী ও মাখদুম-উল-মুলক প্রমুখ গোঁড়া আলেমদের স্বরূপ উন্মোচন, উদারপন্থী পণ্ডিত মোবারক ও আবুলফজলের আবির্ভাব, ভক্তিবাদ ও সুফীবাদের জনপ্রিয়তা ইত্যাদি উপাদানসমূহের সম্মিলিত অবদানের ফল হলো আকবরের উদার ধর্মনীতি (Sharma,1977)।

আকবরের উদার ধর্মচিন্তার পেছনে কেনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। ষোল শতকের ভারতবর্ষ অবশ্যই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা ব্যতীত শক্তিশালী ও স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নয়, তা সম্রাট আকবর খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। (সুলতানি আমলে তুর্কী শাসকগণ শাসন থেকে অমুসলিম প্রজাদের দুরে রাখেন, যার ফলে তাঁরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্যতা কখনোই অর্জন করতে পারেননি)। ১৫৬২-৬৭ সাল পর্যন্ত আকবর প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করেন, তুরানি-উজবেকি বিদ্রোহ উক্ত সময়ে তাকে সন্ত্রস্ত রাখে। আকবরের ভ্রাতা, সিংহাসনের আরেক দাবিদার মীর্জা হাকিম ছিলেন বিদেশী স্বার্থের সংরক্ষক। আকবর অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, ব্যাপক সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে মুঘল শক্তি হবে ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রশ্নাতীত আনুগত্য তাঁর ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। নিউ কেমব্রিজ হিষ্ট্রির রচয়িতা অধ্যাপক জন রিচার্ডসকে সমর্থন করে বলা যায় যে আকবরের সমন্বয়বাদী চিন্তাভাবনার পশ্চাতে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ছাড়াও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল (Richards, 1994)। তাঁর প্রয়াস ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের আস্থা না হারিয়ে হিন্দু সম্পপ্রদায়ের আস্থা অর্জন। সেটি তার পূর্ববর্তী শাসকবর্গের নিকট অসম্ভব প্রতিপন্ন হলেও আকবর এই অসম্ভবতুল্য কাজকেই সম্ভব করেছিলেন।

সম্রাট আকবরের ধর্মদর্শনের প্রকৃতি

এ পর্যায়ে সম্রাট আকবরের ধর্মদর্শনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। সম্রাট আকবর তাঁর শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে উদার ধর্ম চিন্তার প্রমাণ দেন। মানবিক দৃষ্টিকোন থেকেই ১৫৬২ সালে আকবর যুদ্ধবন্দীদের বাধ্যতামূলকভাবে দাসে পরিণত করা এবং জোরপূর্বক তাঁদের ইসলাম গ্রহণ করানোর যুগ যুগ ধরে চলে আসা নীতিতে ইতি টানেন (Rizvi, 1987)। উদীয়মান রাজপুত শক্তির হৃদয় জয় করার জন্য তিনি সর্বপ্রথম নীতিগতভাবে ১৫৬৩ ও ১৫৬৪ সালে তীর্থকর ও জিজিয়া

কর প্রত্যাহার করেন (Mahajan, 1970)। আকবর তাঁর হিন্দু পত্নীদের নিজধর্মীয় অনুশাসন পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। তৎকালীন চিত্রকর্মগুলো তারই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর শাসনের সর্বত্রই প্রজাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে যেন কোনো বাধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। নিজ অধিকৃত অঞ্চলের ধর্মালয়সহ যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলসমূহের ধর্মালয় যাতে সৈন্যবাহিনী কলুষিত না করে, সে ক্ষেত্রে আকবর প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে মুসা আনসারী বলেন, "প্রথম ১৫৬৩ ও ১৫৬৪ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর থেকে তীর্থকর ও জিজিয়া কর বিলোপের মধ্যদিয়ে তার উদার ধর্মনীতির প্রতিফলন ঘটে। অথচ এই সময় তিনি গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন। সূফীবাদ ও সুল ই কুলে তখনও তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেননি" (আনসারী,১৯৯২:৮৯)।

আকবরের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা যে ভিন্ন ধারায় ধাবিত হচ্ছে, তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৫৭৫ সালে ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নামে একটি ধর্মীয় আলোচনা সভাগৃহ নির্মাণের মাধ্যমে। ফতেহপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নির্মাণের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার একটি কেন্দ্র তৈরি করা। তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মের সুন্নী মাজহাবের উলেমাবর্গকে আমন্ত্রণ জানান এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা শোনেন। তাতে তাঁর মনে যে ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হয়, তাঁর আশানুরূপ সমাধান সুন্নী উলেমাবর্গ দিতে পারেননি। সুন্নী মাজহাবের উলেমাবর্গ যখন তাঁর অনুসন্ধিৎসু সত্তার জ্ঞানপিপাসা মিটাতে ব্যর্থ হন, তখন তিনি অন্যান্য মাজহাবের উলেমাবর্গকে আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের মধ্যকার সংলাপ সম্রাট আকবরকে, বিভিন্ন মাজহাবের উলেমাদের সংলাপের স্থলে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংলাপের সম্ভাবনার দিকে উৎসাহিত করে। আকবর বিশ্বাস করতেন যে মত বিনিময়ের একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে পারলে মতের অমিল দূর করা সম্ভব। পরবর্তীকালে আকবর বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিত ব্যাক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানান ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে। আকবরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে গোয়ার কতিপয় জেসুইট পাদ্রি ইবাদতখানায় আসেন এবং ক্রমে আকবর তাঁর ইবাদতখানায় হিন্দু ধর্মের, জৈন ধর্মের, জরথ্রুস্ত ধর্মের পণ্ডিতবর্গকে আমন্ত্রণ জানান। মূলত এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আকবরের ইবাদতখানায় ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, জৈন ধর্ম, জরথ্রুস্ত ধর্মের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংলাপ সংঘটিত হয়।

সম্রাট আকবরের ধারণা ছিল বিভিন্ন ধর্মের গুরুদের মধ্যে যদি মতবিনিময়ের একটি ক্ষেত্র তৈরি করা যায়, তাহলে এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মালম্বী প্রজাদের মধ্যকার তিক্ততা দূর করে একটি সমন্বয়সাধন সহজেই সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে দেখা গেল পণ্ডিতেরা পরস্পরের ধর্মমতকে উগ্র ভাষায় আক্রমণ করছেন। আর সি মজুমদার একে "Vulgar Rancour" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন (R. C. Majumdar, 1978)। এতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত কমার বদলে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় ১৫৮১-৮২ সালে আকবর ইবাদতখানায় ধর্মীয় বিতর্ক বন্ধ করে দেন। আকবর এরপর বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতবর্গকে ডেকে তাঁদের কাছ থেকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। আবুল ফজল তাঁর *আইন এ আকবরিতে* উল্লেখ করেন যে এই সময় সকল ধর্মের প্রধান পুস্তকগুলো তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। এ সময় আকবর ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখান বলে জানা যায়। বলা হয় যে এসময় তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি, হিন্দু ধর্মের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন, জৈন ধর্মের অহিংস মতবাদ থেকে তিনি নিরামিষভোজী হন এবং তাঁর

সভার অপরাপর ব্যাক্তির আমিষভোজনের প্রতি নিরুৎসাহিত করেন (Mahajan, 1970)। আকবর এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন হলেও মূলনীতিগুলো বা মৌলিক বিষয়গুলো মোটামুটি এক ও অভিন্ন। আকবর এ সময় বিশ্বাস করেন যে যদি ধর্মীয় গোড়ামী ও ধর্মে-ধর্মে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতকে পরিহার করা যায়, তাহলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। তবে পরবর্তীকালে তার 'দীন-এ-ইলাহী' নামে নতুন একটি ধর্মের অবতারণা অবশ্যই এই সমন্বয় প্রচেষ্টার পরিণত রূপ ছিল। নিম্নে তার ধর্ম দর্শনের প্রধান তিনটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

মহজরনামা

১৫৭৯ সালে আকবর 'মহজরনামা' নামে একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন, যার মূলকথা ছিল মুসলিম উলেমাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে বাদশাহ্ চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিবেন। কারণ তিনি হলেন প্রধান ইমাম বা ইমাম-ই-আদিল। ভিনসেন্ট স্মিথসহ কতিপয় ইতিহাসবিদ এই মহজরনামার তীব্র সমালোচনা করেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল মহজরনামায় স্বাক্ষরে অধিকাংশ সভাসদের মত ছিল না। আই এইচ কোরাইশী এ প্রসঙ্গে বলেন যে মহজরনামার মাধ্যমে আকবর ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত করেন, এ বক্তব্য হয়তো আংশিক সত্য। আংশিক সত্য এই অর্থে যে উলেমাবর্গের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় তাঁদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ জন্ম নেয়। তবে সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার বক্তব্যটি অতিরঞ্জিত। এ প্রসঙ্গে মুসা আনসারী বলেন "আহলে কলম ও আহলে তেগের এক সভায় বহু পণ্ডিতদের স্বাক্ষরিত এই মহজারনামা গৃহীত হয়" (আনসারী, ১৯৯২:৯০), যার অর্থ দাড়ায় মুঘল দরবারের বহু পণ্ডিতব্যক্তির সম্মতিতে এই মহজরনামা স্বাক্ষরিত হয় তারা স্বেচ্ছায় সেখানে স্বাক্ষর করেন। সম্রাট আকবর জোড়পূর্বক মহজরনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলিমদের অসন্তুষ্ট করে শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলার মতো অদূরদর্শী শাসক আকবর অবশ্যই ছিলেন না। তবে মহজরনামার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালীন সময় ইরানের শাহ নিজেকে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে দাবি করেন। অপরদিকে অটোমান তুর্কি সুলতান নিজেকে বিশ্ব সুন্নি সম্প্রদায়ের খলিফা হিসেবে দাবি করেন। শিয়া ও সুনি সপ্রদায়ের প্রধান শাহ ও খলিফা ভারতের মত জানতে ইচ্ছুক ছিলেন। বস্তুত সম্রাট আকবর ভারতবর্ষকে ইরানের শাহ ও খলিফার প্রভাবমুক্ত রাখার একটি প্রয়াস পান এই মহজরনামার মাধ্যমে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতীয় স্বাদেশিকতার একটি পরিচয় এই মহজরনামা অবশ্যই বহন করে। পাশাপাশি ইরানি ও তুর্কিদের সমর্থন না জানিয়ে আকবর প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, কারণ তাতে ভারতীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী তাঁকে বিশ্বের মুসলিমদের সমর্থক ভাবতে পারতেন।

সুল-ই-কুল

১৫৮০ সালে আকবর তাওহিদে এলাহির ভিত্তিতে 'সুল-ই-কূল' আদর্শের পতাকা উত্তোলন করেন। 'সুল-ই-কূল'-এর মূলকথা ছিল সকল প্রকার রক্ষণশীলতা বর্জন করা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রভুতে বিশ্বাসী সকল মানুষ সমান, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থাকা ও একে অপরের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে 'সুল-ই-কূল' ছিলো পরমত সহিষ্ণুতার একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। "সবার

উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই", বড়ু চন্ডিদাসের এই উক্তিটি মূলত আকবরের 'সুল-ই-কুল'-এর বক্তব্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত এই 'সুল-ই-কুল তার মানবতাবাদী আদর্শের প্রকৃত পরিচয় বহন করে।

দীন-এ-ইলাহী

১৫৮২ সালে আকবর 'দীন-এ-ইলাহী' নামে একটি ধর্মবিশ্বাসের প্রবর্তন করেন। বলা হয়ে থাকে আকবরের ধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার সর্বশেষ ধাপ ছিল এটি। বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলো নিয়ে আকবর এ নতুন ধর্মমতের অবতারণা করেন বলে জানা যায়। স্যার এসএএ রিযভি উল্লেখ করেন, যে তিন দফায় খৃষ্টান মিশনারি আকবরের সভায় আসার সুযোগ পায়, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় মিশনে আগত ফাদার ড্যানিয়েল বারতলি বলেন যে ১৯৮২ সালে কাবুল অভিযান থেকে ফিরে আকবর বিভিন্ন ধর্মের সার নিয়ে এক নতুন ধর্মবিশ্বাসের অবতারণা করেন। এ প্রসঙ্গে Rizvi বলেন, "Compounded out of various elements, taken partly from the Koran of Muhammad, partly from the scriptures of the Brahmans, and to acertain extent, as far as suited his purpose, from the Gospel of Christ"(Rizvi,1987:68)।

'দীন-এ-ইলাহীর' বৈশিষ্ট্য ছিলো এইরূপ যে, হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই এই ধর্মে দীক্ষিত হতে পারবে। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকলে সিংহাসনের প্রতি সমান আনুগত্য প্রকাশ করবে। মূলত উক্ত অভিপ্রায়েই সম্রাট আকবরের এই ধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ও নবধর্মের অবতারণা। এই ধর্মমত সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে আকবর কী বলেন সে বিষয়ে সঠিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। ধর্মমত বিষয়ে যে কয়েকজন ব্যক্তির বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, তাদের প্রত্যেকের বক্তব্যই পক্ষপাত দোষে অথবা গোঁড়া সমালোচনার দোষে দুষ্ট। আকবরের অন্যতম সভাসদ ও দীন-এ-ইলাহীর কতিপয় বিশ্বাসীর মধ্যে একজন আবুল ফজল- তিনি আকবরকে আধাদৈব চরিত্রের অধিকারী 'ইনসানে কামেল' নামে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে জওহারে নফিসার অধিকারী আকবর বিভ্রান্ত মানুষের জন্য এক আলোকবর্তিকা। তাঁর স্বাভাবিক ঔচিত্যবোধ ও মঙ্গল-কামনা হতেই তাঁর উদার ধর্মনীতি উৎসারিত হয়েছে। অপরদিকে বাদাউনী 'দীন-এ-ইলাহী'কে ইসলাম ধর্ম হতে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি মনে করেন (Mahajan, 1970)। তাঁর মতে আকবর 'দীন-এ-ইলাহীর' জন্য যে ধরনের অনুশাসন প্রস্তুত করেন, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী। তৃতীয় মিশনে আগত ফাদার জেরোমি জাভিয়ার, যিনি ১৫৯৪ সালের কোনো এক সময় আকবরের দরবারে আসেন। তাঁর ভাষায় আকবর মুসলিম ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন কুসংস্কারচ্ছন্ন পেগান। আকবর এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন, যার প্রধান থাকবেন তিনি নিজে। আকবরের তখন অগণিত ভক্ত ছিল। এদেঁর সিংহভাগ ছিল তোষামোদকারী এবং উৎকোচ গ্রহণকারী (Rizvi,1987)। আর পি ত্রিপাঠী মন্তব্য করেন, আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে বাদাউনী ও জেসুইট লেখকদের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়, কারণ তাঁরা তথ্যগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন এবং পক্ষপাতহীন বিচার করেননি। ত্রিপাঠীর বক্তব্য অযৌক্তিক নয়। বাদাউনী একদিকে যেমন ছিলেন গোঁড়া মুসলিম, অপরদিকে জেসুইট পাদ্রিগণও অর্থডক্স খৃষ্টধর্মীয় চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের পক্ষে ধর্ম সমন্বয়ের মতো অগ্রগামী চিন্তার সাথে তাল মেলানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যসুত্রের

জন্য তাঁদের রচনার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। এমতাবস্থায় তথ্য সংগ্রহের পর তার বস্তুনিষ্ঠ মুল্যায়নের দায়িত্ব আধুনিক ইতিহাসবিদদের উপরই বর্তায়।

দীন-এ-ইলাহী সম্পর্কে অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে জানা যায় যে এর কোনো ধর্ম গ্রন্থ ছিল না এবং ধর্ম প্রচারের জন্য কোনো প্রচারকও ছিলনা। যাঁরা এই ধর্মের দীক্ষা নিতেন, তাদেরকে সম্রাট আকবরের নিকট হতে সরাসরি দীক্ষা নিতে হতো। নতুন প্রার্থীদের সম্রাট আকবর রবিবারে দীক্ষা দিতেন (Mahajan, 1970)। বাদাউনী উল্লেখ করেন যে দীক্ষাগ্রহণের সময় আকবর তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে চার ধাপের আনুগত্য দাবি করতেন। ধাপগুলো হলো- প্রাণ, সম্পত্তি, সম্মান ও ধর্ম। যে দীন-এ-ইলাহীর দীক্ষাগ্রহণ করবে, সে এই চারটি বস্তু ত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে (Tripathy, 1963)। কথিত আছে যে এ বিশ্বাসের অনুসারীদের আকবরের ছবি পাগড়িতে রাখতে হতো। তাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাতে 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ মঙ্গলময়) ও প্রত্যুত্তরে 'জাল্লাল্লাহু' (তাঁর মহীমা বিকশিত হোক) বলতে হতো। তাঁরা যথাসম্ভব নিরামিষ ভোজন করতেন, জন্মদিন ও অন্যান্য উপলক্ষে ভোজের দ্বারা একে অন্যকে আপ্যায়িত করতেন, তাঁরা নৈতিক জীবনযাপন করতেন, বাল্যবিবাহ করতেন না, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ করতেন না, জুয়া খেলা ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকতেন (Mahajan, 1970)।

কতিপয় ইতিহাসবিদ জোরপূর্বক দীন-এ-ইলাহীর ধর্মবিশ্বাস তাঁর সভাসদদের মধ্যে চাপিয়ে দেয়ার জন্য আকবরকে দায়ী করেন। কিন্তু এই দাবির যৌক্তিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত গবেষক ব্লকম্যান দীন-এ-ইলাহীর অনুসারী হিসেবে ১৮জনের নাম লিপিবদ্ধ করেন (Rizvi, 1987)। সমগ্র ভারতবর্ষের একক অধিপতি সম্রাট আকবর যদি জোরপূর্বক দীন-এ-ইলাহী কারো উপর চাপিয়ে দিতেন, তাহলে এর অনুসারীর সংখ্যা অবশ্যই এইরূপ নগণ্য হতো না।

আধুনিক যুগের ইতিহাসবিদদের অনেকেই সম্রাট আকবর-প্রবর্তিত 'দীন-এ-ইলাহীকে পৃথক কোনো ধর্মমতের স্বীকৃতি দেন না। এদেঁর মধ্যে স্যার এসএএ রিজভির নাম প্রণিধানযোগ্য। স্যার রিজভি বলেন– সমসাময়িক ঐতিহাসিক সুত্রের পঠন-পাঠন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে না যে আকবর একটি নতুন ধর্মের অবতারণা করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন আকবর তাঁর অনুসারীদের পূর্বপুরুষের ধর্মত্যাগের কোনো নির্দেশই দেননি। তিনি শুধু নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে ধর্ম যেন কোনোভাবেই সম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে। স্যার রিজভির বক্তব্য অযৌক্তিক নয়। কেননা সম্রাটের প্রতি এই একনিষ্ঠ আনুগত্যই রাজপুতকে রাজপুতের সাথে লড়তে মুসলিমকে মুসলিমের সাথে লড়তে শক্তি যুগিয়েছিল এবং শক্তি যুগিয়েছিল মুঘল সম্রাজ্যকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ শক্তিশালী সম্রাজ্যে পরিণত করতে। তবে স্যার রিজভি এ কথাও স্বীকার করেন যে আকবর বিশ্বাস করতেন যে তিনি তাঁর পদযুগলে আশ্রয় নেয়া ভক্তদের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শনে সক্ষম, কারণ হিন্দু, মুসলিম উভয়ের তাত্ত্বিক বিশ্বাস এই ছিল যে রাজামাত্রই ঈশ্বরের মদদপুষ্ট ব্যক্তি, তাঁর আধ্যাত্মিকতায় কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় আমরা ধরে নিতে পারি যে সম্রাট আকবরের নিজেকে পুজার আসনে অধিষ্ঠিত করার যে প্রচেষ্টা তা অবশ্যই তাঁর নির্বুদ্ধিতার নয়, বরং উক্ত প্রচেষ্টা ছিল যথেষ্ট সময় উপযোগী। তিনি তাঁর প্রতি আনুগত্যের যে মাত্রা নির্ধারণ করেন, তা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় শুধু আধ্যাতিকতার পরিচয়েই পাওয়া সম্ভব ছিল।

ধর্মীয় নীতির প্রশ্নে সম্রাট আকবর একজন বহুল আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে গতানুগতিক পথ পরিক্রমণ করেননি। একদিকে আবুল ফজল আকবরকে আধাদৈব চরিত্রের অধিকারী 'ইনসানে কামেল' রূপে চিত্রিত করেছেন (ফজল, ২০০৮)। অন্যদিকে বাদাউনী দীন-এ-ইলাহীকে আকবরের ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের বিচ্যুতি বলে আখ্যায়িত করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ আকবরের এই ধর্মচিন্তাকে তাঁর জ্ঞানের নয়, বরং মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ বলেন। তিনি সম্রাট আকবরের ধর্মনীতিকে তাঁর "Monument of Folly" বলে আখ্যায়িত করেন। স্মিথ এও বলেন যে তিনি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা চরিতার্থ করার জন্য ধর্মীয় ভণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করেন (Smith, 1958)। অন্যদিকে আর সি মজুমদারসহ আরও অনেক ইতিহাসবিদ স্মিথের এই বক্তব্যকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেন। আর সি মজুমদার সম্রাট আকবরের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "Thus intelligent to an uncommon degree, with a mind alert and inquisitive, he was best fitted by birth, upbringing and association to feel most keenly those hankerings and that spiritual unrest distinguished the century in which he lived. He was not only the child of his century, he was its best replica." (Majumdar, 1978:453-454)।

এখন প্রশ্ন হলো– সম্রাট আকবরের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল? আধুনিক যুগের ইতিহাসবিদদের অনেকেই মনে করেন, আকবর তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে গোঁড়া মুসলমান না হলেও সংস্কারবাদী ও সংশয়বাদী মুসলিম ছিলেন, আর তাঁর প্রবর্তিত 'দীন-এ-ইলাহী' কোনো ধর্মমত ছিল না। আকবর কখনও তার আদিধর্ম বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করেননি, তবে তিনি ইসলামের মতামত সম্পর্কে সংশয়বাদী ছিলেন। অন্যদিকে ব্লকম্যান, স্মিথ প্রমুখ মনে করেন, আকবর সম্পূর্ণরূপে ইসলামত্যাগ করেছিলেন। হাঙ্গেরিয়ান ইতিহাসবিদ ইগনাগ গোল্ডজিহার বলেন "The religion of Akbar is not to be looked upon as reform but a denial of Islam". (Goldziher, 2009:330)। প্রকৃতপক্ষে সমকালীন ঐতিহাসিকসূত্রের পঠনপাঠন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে না যে সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছেন, কারণ তিনি প্রকাশ্যে ইসলামবিরোধী কোনো বক্তব্য রেখেছেন, এরূপ কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদের নিকট তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। তবে তিনি ইসলামের আচরিত অনুসঙ্গের প্রতি যত্নশীল ছিলেন, একথাও দৃঢ়ভাবে বলা যায় না। অর্থাৎ সার্বিক বিচারে এ কথা বলা যায় যে সম্রাট আকবর ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার, সহনশীল ও পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার ধারক-বাহক ছিলেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজ্যের সকল প্রজার প্রতি সমান দৃষ্টি পোষণ করতেন, যাতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

আকবর-পরবর্তী সম্রাটদের ধর্মীয় চিন্তার প্রকৃতি

আকবর-পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের চিন্তাধারা একই দিকে ধাবিত হয়েছে বলে দাবি করা যায় না। আকবর-পুত্র নুর উদ্দীন মুহাম্মদ সেলিম, যিনি সিংহাসনারোহনের পর জাহাঙ্গীর উপাধি নেন (Mahajan, 1970), তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতার পথেই হাটেন। পিতার উদার ধর্মচিন্তার সাথে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরিচয় বাল্যকাল থেকেই ঘটে। পিতার মতো সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার অধিকারী না হলেও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা তাঁর মধ্যে কখনোই স্থান পায়নি। তাঁর

সময়কালে সম্রাট আকবর কর্তৃক ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতির আদর্শে গৃহীত সকল সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁর সময়কালে মুঘল-শিখ বিরোধের বীজ রোপিত হয়। নির্যাতনের মাধ্যমে শিখ গুরু অর্জনদেবের মৃত্যু মুঘল-শিখ সম্পর্কে বিষবাষ্প ছড়ায়। কথিত আছে সম্রাট জাহাঙ্গীর-পুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাঁর লাহোর অভিযানে গুরু অর্জনদেব অর্থ সাহায্য করেন। এতে সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হয়ে গুরু অর্জনদেবকে আড়াই লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। গুরু অর্জনদেব জানান তাঁর কাছে কোনো অর্থ নেই, যে অর্থ তাঁর হাতে আছে, তা শিখপন্থের সম্পত্তি। এমন পরিস্থিতিতে ক্রুদ্ধ জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং কারারক্ষীর অত্যাচারে তার মৃত্যু হয়। ঈশ্বরীপ্রসাদ এ বিষয়ে মন্তব্য করেন জাহাঙ্গীর ক্রোধবশত ভুলে যান যে এই সময় পাঞ্জাবে শিখ ধর্ম নব প্রেরণায় উদিত হয়েছিল। তিনি এই ধর্মের গুরুকে শ্রদ্ধা না দেখিয়ে, নির্যাতন করে শিখ সম্প্রদায়ের সাথে মুঘল বিদ্রোহের বীজ বপন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর গুরু অর্জনের সাথে সাধারণ অপরাধীর মতো ব্যবহার করে মহাভুল করেন (Prasad, 1974)। বস্তুত সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই ভুলের জের তার বংশধরদের টানতে হয়।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র সাহাব উদ্দীন মুহাম্মদ খুররম, যিনি পরবর্তীকালে শাহজাহান উপাধি নেন, তাঁর মাতা ছিলেন হিন্দু রাজপুত রাজা উদয় সিং-এর কন্যা জগত গোঁসাই বা যোধা বাই। হিন্দু রাজপুত মাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রশ্নে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন অনুদার ও গোড়া। শাহজাহান সিংহাসন আরোহণ করে ইসলামি শাসন কায়েমের চেষ্টা করেন (Richards, 1994)। জাহাঙ্গীরের আমলে এক মুসলিম মৌলবাদী শ্রেণির জন্ম হয়, যাঁরা আকবর ও তাঁর পূর্বপুরুষের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আচরণকে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি মনে করতেন। শাহজাহানের শাসনে তাঁরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চরম উগ্রবাদী আচরণ প্রদর্শন করেন। ১৬৩৩ সালে শাসনের ষষ্ঠ বছরে শাহজাহান মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে শরিয়তি নিষেধাজ্ঞা চালু করার চেষ্টা করেন। এনায়েত খাঁর *শাহজাহাননামার* বিবরণ অনুযায়ী বারাণসীতে তিনি কয়েকটি নতুন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন (Sharma,1989)। সম্রাট শাহজাহানের সময়কাল ছিল মুঘল সম্রাজ্যের স্থাপত্যশৈলীর স্বর্ণযুগ, কিন্তু একথাও সত্য তাঁর স্থাপত্যকীর্তিতে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। শিখ-মুসলিম বিরোধের যে সূচনা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে হয়, সে বিরোধ শাহজাহানের সময় এসে আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। শাহজাহানের সময়কালেই শিখ ও মুঘল সৈন্যের প্রথম প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। এতে মুঘল বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পাঞ্জাবের আঞ্চলিক মুঘল শাসন শিখ শক্তির উত্থানকে হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করে শিখদের প্রতি চরম নিপীড়নমূলকনীতির আশ্রয় নেয়া হয়। এতে করে শিখদের চরম লোকবল ও অর্থবলের ক্ষতি হয়, কিন্তু মুঘল বাহিনী তাদের মনোবলের কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারেনি।

সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ঔরঙ্গজেব, সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করে যিনি ক্ষমতায় আসেন, মুঘল ইতিহাসে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসহিষ্ণু সম্রাট। সম্রাট আকবর কর্তৃক ধর্মীয় সহিষ্ণু নীতির আদর্শে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রায় প্রত্যেকটিই তিনি রদ করেন। বিশেষ করে তিনি মহজরনামার কার্যকরিতা রহিত করে উলেমা সম্প্রদায়কে তাঁদের পূর্ববর্তী অধিকার ফিরিয়ে দেন। ইরফান হাবিবের মতে-সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুসলিম ধর্মগুরু ও যাজকদেরকে বংশানুক্রমিকভাবে বহু নিষ্কর জমি দান করেন (Habib, 2005)। তিনি ১৬৬৯ সালে এক ফরমান দ্বারা হিন্দুদের

মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ দেন (Mahajan, 1970:162-163)। তবে *মুন্তাখাব ই লুবারের* রচয়িতাসহবেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ বলেন যে সম্রাট পুরাতন মন্দির ধ্বংস করতে বলেননি, তিনি অবৈধভাবে নতুন যে মন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছিল, সেগুলোই ধ্বংস করতে বলেন। কিন্তু অত্যুৎসাহী প্রাদেশিক শাসকগণ কতিপয় পুরাতন বিখ্যাত মন্দিরও ধ্বংস করেন। কেবল রাজপুতানায়ই ২৪০টি মন্দির ধ্বংস করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির, বারানসীর বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার কেশবনাথ মন্দির। এ সময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি-খ্যাত মথুরার নাম বদলে ইসলামাবাদ রাখা হয়। ঔরঙ্গজেবের শাসনের ১১তম বৎসরে দরবারে নৃত্য ও সংগীত নিষিদ্ধ করা হয়। সিংহাসনে আরোহনের ১৭তম বৎসরে তিনি অমুসলিমদের জন্য তীর্থকর ও জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তন করেন। যেখানে মুসলিম ব্যবসায়ীরা তাঁদের বাণিজ্য সামগ্রীর জন্য আড়াই শতাংশ শুল্ক দিতেন, হিন্দু ব্যবসায়ীদের জন্য তা ছিলো পাঁচ শতাংশ। কথিত আছে যে তিনি হিন্দুদের হোলি, দীপাবলী, বসন্ত উৎসব, ধর্মমেলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেন (Mahajan, 1970:164)। দরবারে শিয়াদের প্রধান উৎসব নওরোজ পালন নিষিদ্ধ করা হয়। সম্রাটের জন্মদিনে তুলাদান (সম্রাটের ওজনের সমান স্বর্ণ-রৌপ দান করা), যা আকবরের সময় থেকে চলে আসছিল, তা রদ করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় যে এটি হিন্দুয়ানি অনুষ্ঠান।

যদুনাথ সরকারের মতে, ঔরঙ্গজেব আকবরের এই সমন্বয়বাদী জাতীয় নীতি ছেড়ে ভারতবর্ষকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করে মহা ভুল করেন। এজন্য তাঁকে জীবনভর বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। শিখগুরু তেঘবাহাদুরকে তাঁর ধর্মান্ধতার বলি হতে হয়। তাঁর নীতির বিরুদ্ধে জাঠ, সৎনামী, বুন্দেলা, শিখ, রাজপুত মারাঠারা অস্ত্র ধরেন। সম্রাট সারাজীবন যুদ্ধ করে হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় ১৭০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন (Sarkar, 1919)। তবে ঔরঙ্গজেব তাঁর শাসনের সকল পর্যায়ে সমানভাবে অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন, একথা বলা যায় না। ১৬৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি সম্রাট শাহজাহানের ধর্মনীতিকে অনুসরণ করেন। বলা হয়ে থাকে ঔরঙ্গজেব তাঁর শাসনের প্রথম বারো বছর ধর্মীয় ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা দেখাননি, বারোতম বৎসরে তাঁর ধর্মনীতির আমুল পরিবর্তন ঘটে। তবে একথাও বলা যায় না যে এর পূর্বে তিনি সম্পূর্নরূপে পরমত সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। কিন্তু বারো বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রতি যে রূপ দমন-পীড়ন নীতি অবলম্বন করেন, তা ইতিহাসে বিরল। ১৬৮৯ সালে তাঁর ইসলামিকরণ নীতিতে ভাটা পরে। যদুনাথ সরকারের ভাষায়-"নিষ্ঠাবান ঔরঙ্গজেব বরং তাঁর সিংহাসন হারাতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তার ধর্ম ও শাসননীতি পরিবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না (Sarkar,1919)। ঔরঙ্গজেব একজন গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। মুসলিম কোনো রাষ্ট্রের তিনি আদর্শ খলিফা হতে পারতেন, সে বিষয়টি সন্দেহাতীত। কিন্তু ভারতবর্ষের নানান জাতি, ধর্ম ও বর্ণের নর-নারীতে অধ্যুষিত অঞ্চলকে ইসলামিকরণের যে প্রচেষ্টা তিনি করেন, তা সত্যিই হাস্যকর প্রয়াস মাত্র। বস্তুত ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিকভাবে অদূরদর্শী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গোঁড়া মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি কল্যাণমুখি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেননি, পরিচিত হয়েছেন ভারতবর্ষের জন্য 'অযোগ্য শাসক' হিসেবে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে সম্রাট আকবরের উদার ধর্মদর্শন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে, যা তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানি শাসনামলে অনুপস্থিত ছিল। তিনি

হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের প্রতি সমদর্শী নীতি প্রয়োগ করেন। প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো তিনি যোগ্যতার নিরিখে সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে তাঁর সিংহাসন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আনুগত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁর ধর্মসহিষ্ণু আচরণ ধীরে ধীরে ধর্মসমন্বয় প্রয়াসে রূপ নেয়। তাঁর প্রবর্তিত দীন-এ-ইলাহী সাধারণ ভারতবাসীর মনোজগতে তেমন সারা ফেলতে না পারলেও সেটি ভারতের আপামর জনসাধারণকে প্রশ্নাতীত রাজানুগত্যে দীক্ষিত করে। তবে আকবরের উত্তরাধিকারীগণ তাঁর ধর্মীয় নীতির যথার্থ অনুসরনে ব্যর্থ হন, যা ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের পতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে ঐতিহাসিকগণ চিহ্নিত করেছেন। সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে যে সম্রাট আকবরের ধর্মচিন্তা অত্যন্ত যুগোপযোগী ছিল। ধর্ম নিয়ে তাঁর নতুন চিন্তা ও প্রচেষ্টা হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। অর্থাৎ তাঁর ধর্মদর্শন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংহতি অর্জনেও সফল হয়েছিল। এজন্য প্রাসঙ্গিকভাবে একথাও বলা যায় যে সম্রাট আকবরের ধর্মদর্শনের অনুসঙ্গ বর্তমান বিশ্বকেও ধর্মীয় সংঘাতমুক্ত একটি নির্মল পরিবেশ দিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

আমিনুল ইসলাম, (১৯৮৪). *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*. ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান

আবুল ফজল, (২০০৮). *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী*. (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক অনূদিত). বন্দ্যোপাধ্যায়, Trans.) ঢাকা দিব্য প্রকাশ

মুসা আনসারী, (১৯৯২). *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*. ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী

A. L. Srivastava, A. T. (1965). A Short History of Akbar the Great. Agra: Agra College

Fazal, A. (1907). Akber Nama. Calcutta: The Asiatic Society

Goldziher, I. (2009). Muhammad and Islam. (K. C. Seelye, Trans.) New Jersey: Gorgias Press

Habib, I. (2005). The Agrarian System in Mughal India,. New Delhi: Oxford University Press

Husain, Y. (1959). Glimpses of Medieval Indian Culture. Bombey: Asia Pub. House

Mahajan, V. D. (1970). History of Medieval India. New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

Prasad, I. (1974). The Mughal Empire. Allahabad: Chugh Publications

R. C. Majumdar, H. C. (1978). An Advanced History of India (4th ed.). New Delhi: Macmillan India Ltd.

Richards, J. F. (1994). The New Cambridge History of India Vol 1.5: the Mughal Empire. Cambridge, England: Cambridge University Press

Rizvi, S. (1987). The Wonder that was India. London: Sidgwick & Jackson Ltd.

Sarkar, J. (1919). History of Aurangzib. Calcutta: Sri Gouranga Press

Sharma, S. R. (1989). Religious Policy of Mughal Emperors. Delhi: Munshiram Manoharal Publishers

Smith. V. A. (1917). Akbar the Great Mogul. London: Oxford, Claredon Press

Smith, V. A. (August 15, 1981). The Oxford History of India (4th ed.). (PercivalSpear, Ed.) London: Oxfrod University Press

Spear, P. (1961). A History of India(Vol. 2). London: Penguin Books

Tripathy, R. P. (1963). Rise and Fall of Mughal Empire. Allahabad: Central Book Depotr